১১

জ্যোতির্বিজ্ঞান
ASTRONOMY

প্রধান শব্দ (Key Words) : মহাবিশ্ব, বিগ ব্যাং তত্ত্ব, বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্ব, মহাবিশ্বের পরিণতি, আবদ্ধ মহাবিশ্ব, উন্মুক্ত মহাবিশ্ব, সমতল মহাবিশ্ব, নক্ষত্র, ক্ষেত্র কণা, শ্বেতবামন, কৃষ্ণবিবর, সুপারনোভা, নিউট্রন তারকা, রেডিও টেলিস্কোপ, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, গামা-রে টেলিস্কোপ, এক্স-রে টেলিস্কোপ, কৃত্রিম উপগ্রহ, পার্কিং কক্ষপথ।

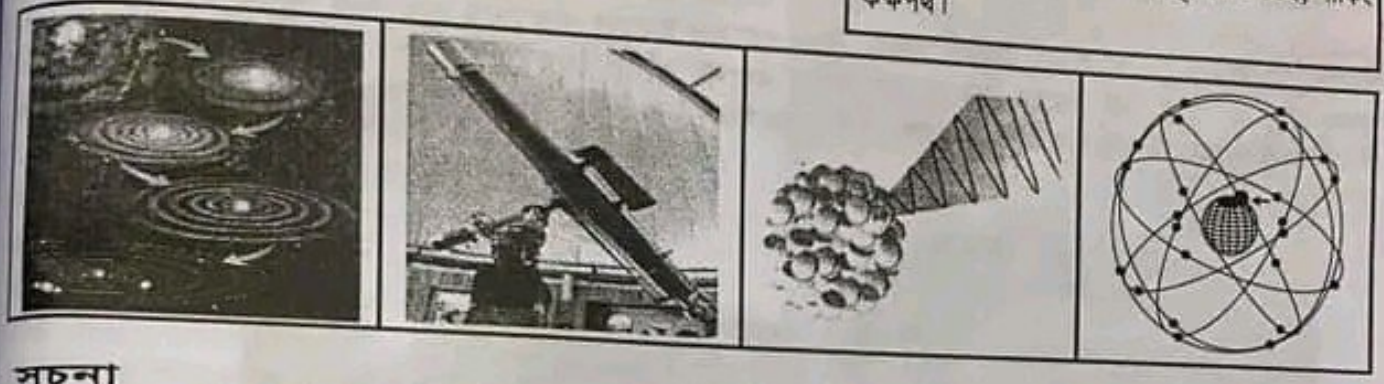

সূচনা
Introduction

যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা-ই মহাবিশ্ব। পৃথিবী মহাবিশ্বের অংশ। ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সব গ্রহও মহাবিশ্বের অংশ। ধূলি, গ্যাসের তারা এবং মেঘ মহাবিশ্বের অংশ। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য এবং তার পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাবিস্ফোরণই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্য। আবার সংকোচন ও কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি অতঃপর তারার মৃত্যু এসব মহাবিশ্ব ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এছাড়া মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু যেমন নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ নানাবিধ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত রেডিও টেলিস্কোপ, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, গামা-রে টেলিস্কোপ, এক্স-রে টেলিস্কোপ এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মূলনীতির আলোচনা এ অধ্যায়ের মূল বিষয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের মূল নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১.১ মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য
Mystery of the creation of the universe

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় প্রাচীনকাল হতে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জানতে প্রয়োজন পড়েছে আপেক্ষিক তত্ত্বের, কণা পদার্থবিজ্ঞানের, নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের, তাপগতিবিজ্ঞানের, প্লাজমা ও কঠিনাবস্থার পদার্থবিজ্ঞানের এবং সর্বোপরি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের। মহাবিশ্বের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান হলো বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব বা Cosmology। বহু প্রাচীন ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন ধর্ম মতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বেশ নিকট অতীতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশপ উসার (Bishop Ussher) হিসাব করে বলেছিলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল 4000 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। ওল্ড টেস্টামেন্টের লোকদের বয়স যোগ করে তিনি এই হিসাব পেয়েছিলেন। অন্যদিকে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতো কিছু লোকের মনে হয়েছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে। এখন প্রশ্ন হলো মহাবিশ্ব কী ? বা What is universe ? এর জবাব হলো যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই-ই মহাবিশ্ব। পৃথিবী মহাবিশ্বের অংশ। ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সব গ্রহও মহাবিশ্বের অংশ। ধূলি গ্যাসের তারা এবং মেঘ মহাবিশ্বের অংশ। আর এগুলো একত্রে মিলেমিশে আমাদের এই সৌর জগৎ। অন্যান্য তারার মতো সূর্যও একটি উত্তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। সব মিলিয়ে বিস্ময়কর বিশাল এই মহাবিশ্ব।

বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের জন্ম শুরু হয় 1916 সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of general relativity) প্রণয়নের পর থেকে। এই তত্ত্ব মহাকর্ষকে বিশ্বের স্থানকালের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভাবতে শেখায়। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মধ্যে যে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বীজ লুকিয়েছিল ... এই বিশ্বের সকল জড় বস্তুই অন্য সকল জড় বস্তুকে আকর্ষণ

করে। এই আকর্ষণ যদিও দূরত্বের সঙ্গে কমে যায়, তা সত্ত্বেও এই পরস্পর আকর্ষণের ফলে সমস্ত বস্তুরই ক্রমাগত পরস্পরের সান্নিধ্যে চলে আসার কথা ও অবশেষে একত্রে মিশে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ মহাকর্ষের প্রভাবে আমাদের পরিচিত বিশ্ব চিরস্থায়ী থাকতে পারে না।

1929 সালে এডউইন হাবল (Edwin Hubble)-এর মহাবিশ্বের প্রসারণ আবিষ্কারের ফলে এর উৎপত্তি সম্পর্কীয় আলোচনা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। আজ থেকে 1500–2000 কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের আকৃতি ছিল ডিম্বাকার এবং এর ভর ছিল 10^{51} kg এবং ঘনত্ব 10^{21} kg m^{-3}। অভ্যন্তরীণ বিপুল তাপ ও চাপের কারণে প্রচণ্ড শব্দে ডিম্বাকার বস্তুর মহাবিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই মহাবিশ্ব। এটাই বিগ ব্যাং তত্ত্ব (Big bang theory)। এখান থেকেই সময়, স্থান, শক্তি ও পদার্থের উৎপত্তি হয় বলে ধারণা করা হয়। বিগ ব্যাং-এর কারণে সৃষ্ট খণ্ডাংশগুলো বিভিন্ন রূপ যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি নাম নিয়ে প্রতিনিয়ত নির্দিষ্ট হারে দূরে সরে যাচ্ছে [চিত্র ১১·১]। দূরে সরতে সরতে এক সময় এগুলো এদের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। এর অর্থ হলো নীহারিকাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইহাই সম্প্রসারণ তত্ত্ব। যার দূরত্ব বেশি তার পরস্পর থেকে সরে যাবার গতিবেগও বেশি।

চিত্র ১১·১

1965 সালে আমেরিকার নিউজার্সিতে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) আর রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নতুন মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, একটা অদ্ভুত তরঙ্গ চারদিক হতে আসছে। তাঁরা বুঝলেন, এটা হলো মহাবিস্ফোরণের ফলে আলোর তরঙ্গের সরণের ফলে লাল পেরিয়ে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গে পরিণত হবার ফল। তাদের এই আবিষ্কারের জন্য 1978 সালে তারা পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

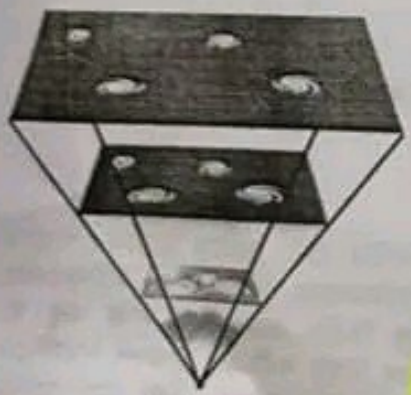

চিত্র ১১·২

বিগ ব্যাং ঘটনার পর নীহারিকাগুলো আর দূরে সরে না গিয়ে বরং পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে আসতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ঘনীভূত হবে। এটি বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্ব [চিত্র ১১·২]। বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্বের সমাপ্তিই হলো বিগ ব্যাং-এর সূচনা। এভাবেই বিগ ব্যাং ও বিগ ক্রাঞ্চ পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। একে পালসার (Pulsar) থিওরি বলে।

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের দূর সীমানায় টেলিস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেন যে, এই মহাবিশ্ব প্লাজমা অবস্থায় অর্থাৎ অস্বচ্ছ আয়নিত গ্যাসে পূর্ণ ছিল। পরোক্ষ হিসাবে দেখা গেছে যে, মহাবিস্ফোরণের 10^{-43} সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10^{32} ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে 10^{10} গুণ। মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের শতভাগের একভাগ সময়টিতে মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ ছিল বিকিরণ, নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলে। তাপমাত্রা তখনো এসব হালকা পদার্থ ও প্রতিপদার্থের কণিকা যুগল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দিতে সক্ষম ছিল। প্রায় দুই সেকেন্ড পর মহাবিশ্ব এতটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো যে, ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল এখন আর নতুন করে সৃষ্টি হতে পারল না এবং ক্রমাগত এরা ধ্বংস হয়ে রূপ নিল শক্তিতে। অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন শুধু অবশেষ থাকল ধনাত্মক প্রোটন কণিকার চার্জের ভারসাম্য বজায় রাখতে। বিকিরণ এখন প্রাধান্য পেল সমস্ত জগৎ জুড়ে প্রতিটি প্রোটন, নিউট্রন বা ইলেকট্রনের জন্য প্রায় শত কোটি আলোক কণিকার। অর্থাৎ ফোটন বিরাজ করছিল তখন মহাবিশ্বে। এরপর মহাবিশ্বের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং উচ্চ শক্তি ফোটনের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ইলেকট্রন-পজিট্রন মিলে যে হারে ফোটন তৈরি করে, সেই হারে আর ফোটন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড় তৈরি করতে পারে না। মহাবিস্ফোরণের তিন মিনিটের মাথায় প্রোটন ও নিউট্রন মিলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হতে থাকে। আরো দেখা যায় মহাবিস্ফোরণের মাত্র দশ লক্ষ বছর পরেই মহাবিশ্বের অতি ঘনীভূত উত্তপ্ত বিস্তারমান বিকিরণ ও কণিকার পিন্ড তাপ হারিয়ে 3000° C নেমে এসেছে। আর এই তাপমাত্রায় এসেই

ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসসমূহের চারপাশে কক্ষপথ নিয়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। এ সময় বায়ু ও বিকিরণ ভারসাম্য লাভ করে একটি সুষম তাপমাত্রায় এসেছে।

বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বে পর্যবেক্ষিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের শতাংশের অনুপাত 3 : 1। বিশ্ব সৃষ্টির পাঁচ থেকে সাত লক্ষ বছর পর এর তাপমাত্রা এত কমে যায় যে, ইলেকট্রন কক্ষপথে আসতে শুরু করে এবং পূর্ণাঙ্গ পরমাণু গঠন সম্পন্ন হয়। ইলেকট্রন পরমাণু গঠনে ব্যবহৃত হওয়ায়, মুক্ত ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা দেয়। এজন্য ফোটন ইলেকট্রন মিথস্ক্রিয়া থেকে সরে গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এর আগ পর্যন্ত বিশ্ব প্লাজমা পূর্ণ ছিল, যা দেখতে সূর্যের বর্ণমণ্ডলের মতো। মহাবিশ্বের এই প্রসারণকে বেলুনের সাথে কল্পনা করা যায়। ধরা যায়, বেলুনের ওপর কিছু রং এর ফোটা দেওয়া আছে। এখন বেলুনটিকে ফুলালে ফোটাগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। মহাকাশে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলা অসংখ্য গ্যালাক্সির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। আবার কখনো দেখা যায় এই প্রচণ্ড গতিতে চলমান দুটি গ্যালাক্সি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে প্রচণ্ড তাপ ও আলো সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে যায়। গ্যাসের মেঘ আর ধূলিকণা হতে সৃষ্ট এই নক্ষত্র বা তারার রাজ্য এবং পরবর্তীতে রূপ নেয় সৌর জগতে [চিত্র ১১·৩]। আর সেই নারকীয় ধ্বংসস্তূপ থেকে ছড়িয়ে পড়া রেডিও তরঙ্গের কিছুটা এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর রেডিও টেলিস্কোপে।

চিত্র ১১·৩

সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology)-এর মৌলিক নীতিই হচ্ছে দিক নিরপেক্ষতা এবং সমসত্ত্ব অবয়ব। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোনো স্থান হতে যে কোনো দিকে দেখা হোক না কেন মহাবিশ্ব একইরকম দেখাবে।

চিত্র ১১·৪

১৯২০ সালে এডউইন হাবল এর প্রথম পর্যবেক্ষণের সময়ের তুলনায় বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ এখন তাদের টেলিস্কোপের দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে এসব দূরতম অবস্থার গ্যালাক্সির যাত্রার শুরুর সময় হিসাব করে মহাবিশ্বের বয়স তাঁরা অনুমান করেছেন দেড় হাজার কোটি বছর।

মহাবিস্ফোরণের পর থেকে যত দিন যাচ্ছে মহাবিশ্বের প্রসারণ একইভাবে বাড়ছে। তবে এই প্রসারণ নিকটবর্তী গ্যালাক্সির জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ আমাদের সৌর জগৎ স্ফীত হচ্ছে না কিংবা গ্রহদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বাড়ছে না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ও ধ্রুবমাতা বা অ্যান্ড্রোমিডা এবং আরো কয়েকটি ছোট গ্যালাক্সি মিলে লোকাল গ্যালাক্সি স্তবক তৈরি করেছে [চিত্র ১১·৪]।

মহাবিশ্ব অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট অবস্থার পর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে এই প্রসারণ থেমে যাবে এবং মহাবিশ্ব পুনরায় সংকোচিত হবে। এই সংকোচন একটি সংকট আকারে পৌঁছালে পুনরায় বিস্ফোরিত হবে এবং নতুন করে প্রসারণ ও তারকার সংকোচন ঘটবে। ফলে মহাবিশ্বের সীমা একবার বড় ও একবার ছোট হবে। অর্থাৎ সীমানা স্পন্দিত হবে। একে স্পন্দনশীল তত্ত্ব বলে। 8×10^9 বছর পর এ ঘটনা ঘটতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর "A Brief History of Time" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই 'বৃহৎ বিস্ফোরণ' তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

কাজ : মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ?

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রসারণের হার, বিশ্বের বক্রতা, বিশ্বে মোট বস্তুর পরিমাণ, মহবিশ্বের গড় ঘনত্ব, সংকট ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

কাজ : হাবল বিধি কী ? ব্যাখ্যা কর।

1929 সনে এডুইন হাবল দীর্ঘ নয় বছর পর্যবেক্ষণ করে দেখিয়েছেন যে ছায়াপথসমূহ অপসারিত হচ্ছে এবং তাদের এই অপসারণ বেগের মান তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক অর্থাৎ $v \propto d$। ইহাই হাবল বিধি। এই সূত্রানুসারে গ্যালাক্সিগুলো প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড বেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং গ্যালাক্সিসমূহের দূরগমনের বেগ আমাদের থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক।

মহাবিশ্বের যে কোনো প্রসঙ্গ কাঠামো বিন্দু থেকে কোনো গ্যালাক্সির দূরত্ব d এবং পশ্চাদপসরণের বেগ v হলে হাবল-এর বিধি অনুসারে,

$v = Hd$; এখানে H হচ্ছে হাবল ধ্রুবক, এর মাত্রা সময়ের বিপরীত। সম্পর্কটি লেখচিত্রে দেখানো হলো :

H এর মান এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। হাবল ধ্রুবক-এর একটি যুক্তিসঙ্গত মান হলো 72 kms^{-1}/MPc (1 MPc = $3{\cdot}084 \times 10^{19}$ km)। অর্থাৎ এক বছরে আলো শূন্য স্থানে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার 3·26 গুণ। 13·8 বিলিয়ন ($13{\cdot}8 \times 10^9$) বছর আগে বিগ ব্যাং সংগঠিত হওয়ার পর থেকে মহাবিশ্ব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কণা পদার্থবিজ্ঞানীদের মহামিলন তত্ত্ব (Grand Unification Theory) এবং জ্যোতি পদার্থবিদদের বিগ ব্যাং তত্ত্ব একত্রে মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্বের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম। বর্তমান মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কণাসমূহের নিম্ন তাপমাত্রা এবং নিম্ন ঘনত্ব। এর গঠন ও বিবর্তন মহাকর্ষ বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত ও শীতল হচ্ছে তাই দূর অতীতে কণাসমূহে উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ ঘনত্বের অধিকারী ছিল। যে সময়ে মহাবিশ্ব ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আয়নের প্লাজমা রূপে ছিল সে সময়ে তড়িৎ চৌম্বক বল মহাবিশ্বের কাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

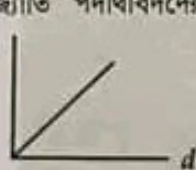

জানার বিষয় : I. বিগ ব্যাং মডেলের জনক জর্জ লেমাইটার।
II. মহাবিশ্বের প্রসারণ আবিষ্কার করেন এডউইন হাবল।

গাণিতিক উদাহরণ ১১.১

১। কোনো কোয়াসার থেকে আগত আলোক রশ্মি অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবী থেকে কোয়াসারটি $2{\cdot}7 \times 10^8$ ms^{-1} বেগে সরে যাচ্ছে। পৃথিবী হতে কোয়াসারটির দূরত্ব নির্ণয় কর। [H = 72 kms^{-1}/MPc]

হাবল সূত্র অনুযায়ী, আমরা জানি,

$v = Hd$

বা, $d = \frac{v}{H}$

$\therefore d = \frac{2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1}}{72\ kms^{-1}/MPc} = \frac{2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1} \times MPc}{72\ kms^{-1}}$

$= \frac{2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1} \times 3{\cdot}084 \times 10^{19}\ km}{72\ kms^{-1}}$ [$\because$ 1 MPc = $3{\cdot}084 \times 10^{19}$ km]

$= 1{\cdot}16 \times 10^{26}$ km

এখানে,
বেগ, $v = 2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1}$
হাবল ধ্রুবক, H = 72 kms^{-1}/MPc
দূরত্ব, d = ?

১১·২ পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি
Ultimate fate of the universe in the light of physics

মহাবিশ্বের ভবিষ্যত বা পরিণতি কিংবা মহাবিশ্বের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় ইতিহাস কী হবে ? তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনা থেমে নেই। বর্তমান জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেও বিশ্বের নিয়তি সম্বন্ধে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, কারণ এখানে কয়েকটা অনিশ্চয়তা রয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের নিয়তি কী হবে সেটা কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটতে অবশ্যই অনেক সময় লাগবে। সময়ের ব্যবধানে মহাবিশ্বের পরিণতি কী হবে, তা নিম্নের দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা—

(১) মহাবিশ্বের বর্তমান গঠন কীরূপ এবং
(২) মহাবিশ্ব কীভাবে এই গঠন প্রাপ্ত হয়েছে।

এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর জানলে মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে সে সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে।

সামগ্রিক বিবেচনায় মহাবিশ্বের মূল গাঠনিক উপাদান হলো গ্যালাক্সিগুলো। মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতার মহাসমুদ্রে বিলিয়ন বিলিয়ন দ্বীপ সদৃশ নক্ষত্রের সমন্বয়ে প্রতিটি গ্যালাক্সি গঠিত। পৃথিবী, সূর্য ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ নিয়ে আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করছি তার নাম মিল্কিওয়ে (Milkyway) গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। একে আকাশগঙ্গাও বলা হয়।

মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন বুঝতে হলে মহাবিশ্বের ঘনত্ব প্যারামিটার (parameter) Ω (omega) সম্পর্কে জানা দরকার। ঘনত্ব প্যারামিটার Ω হচ্ছে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব, ρ এবং সংকট ঘনত্ব ρ_C এর অনুপাত। গড় ঘনত্ব ρ বলতে মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব বোঝায় এবং সংকট ঘনত্ব, $\rho_C = \frac{3H^2}{8\pi G}$। এখানে, H হলো হাবল (Hubble) ধ্রুবক এবং G হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। ρ_C এর মান প্রায় $9{\cdot}47 \times 10^{-27}\ kgm^{-3}$। Ω-এর মানের ওপর মহাবিশ্বের জ্যামিতিক গঠন নির্ভর করে। Ω-এর মান 1 এর চেয়ে অধিক বা সমান বা কম হতে পারে। $\Omega < 1$ হলে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে উন্মুক্ত, $\Omega = 1$ হলে আকৃতি হবে সমতল এবং $\Omega > 1$ হলে গঠন হবে আবদ্ধ প্রকৃতির [চিত্র ১১·৫]।

পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। তাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে এক সময় এ সকল গ্যালাক্সিগুলো একত্রে আবদ্ধ ছিল। ধারণা করা হয় প্রায় 1370 কোটি বছর আগে অতি ঘন ও অত্যন্ত উত্তপ্ত ছোট একটি বিন্দু বিস্ফোরিত হয়ে এই মহাবিশ্বের জন্ম হয়। পুঞ্জীভূত সকল পদার্থ ওই মহাবিস্ফোরণের ফলে প্রচণ্ড বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্ফোরণকে বলা হয় বিগ ব্যাং (Big bang)। এর মাধ্যমেই স্থান ও কালের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর পরমাণু, নক্ষত্র এবং সবশেষে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছিল। জন্মের পর থেকেই গ্যালাক্সিগুলো ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এবং পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, মহাবিশ্বের এই প্রসারণ কী চিরকাল অব্যাহত থাকবে, নাকি কোনো এক সময় রুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তবে তারপর কী ঘটবে ? তারপর কী সংকোচন শুরু হবে ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও অজানা। ক্রমাগত ছুটে চলার যে সম্ভাবনা তাকে জ্যোতির্বিদরা বলেন উন্মুক্ত মহাবিশ্ব (Open universe)। আর ছুটে চলা থেমে গিয়ে আবার ভেতর দিকে সংকুচিত হওয়ার যে সম্ভাবনা তাকে বলেন আবদ্ধ মহাবিশ্ব (Closed universe)।

এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটা যে শেষ পর্যন্ত খাটবে তা নির্ভর করছে মহাবিশ্বে আদতে কতটা বস্তু আছে তার ওপরে। মহাবিশ্বে যদি একটা সঙ্কটসীমার চেয়ে বেশি বস্তু থাকে তাহলে তার আকর্ষণের টানে মহাবিশ্বের বাইরের

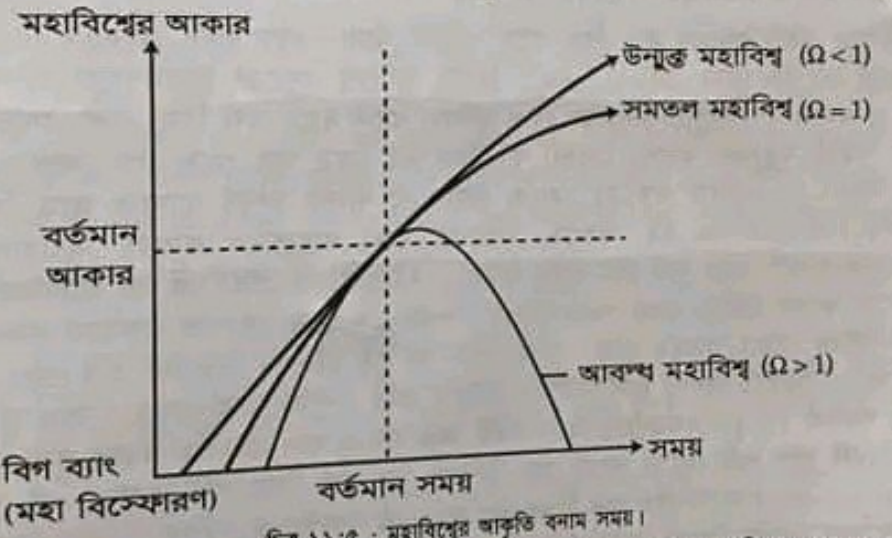

চিত্র ১১·৫ : মহাবিশ্বের আকৃতি বনাম সময়।

দিকে ছুটে চলা একদিন থেমে যাবে আর শুরু হবে ভেতর দিকে ছোটা। এই সঙ্কটসীমা যে কত তার হিসাব করা হয়েছে—সেটা প্রতি ঘন মিটারে তিনটি পরমাণু। কিন্তু দেখা যায় আমাদের জানা মহাবিশ্বে সব গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় তা এই সঙ্কটসীমার ক্ষেত্র 10 থেকে 30 শতাংশ। কারো কারো হিসাবে এটা আরো কম। তবে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন আসলে মহাবিশ্বে বস্তু আছে আরো অনেক বেশি, ভালো করে খুঁজলে সেসব বস্তু একদিন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন, আরো একটা তৃতীয় সম্ভাবনার কথাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, তা হলো মহাবিশ্বে যে পরিমাণ বস্তু আছে তাতে তার বিস্তার এক সময় থেমে যাবে ঠিকই, তবে ভেতর দিকে ধসে পড়বে না; এই মতকে বলা হচ্ছে সমতল মহাবিশ্ব (flat universe)। সমতল মহাবিশ্ব হলো উন্মুক্ত ও আবদ্ধ মহাবিশ্বের মধ্যে বিভাজন রেখা (Dividing line)।

মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে তিনটি মত রয়েছে :

(১) 'আবদ্ধ মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে একদিন থেমে যাবে এবং আবার সঙ্কুচিত হতে হতে মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে ধসে পড়বে।

(২) 'উন্মুক্ত মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল প্রসারিত হবে।

(৩) 'সমতল মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্ব ধসে পড়বে না, আবার অনন্তকাল প্রসারিতও হবে না [চিত্র ১১.৫]।

আবদ্ধ মহাবিশ্ব (Closed universe) : এই তিনটি সম্ভাবনার ফলাফল কী দাঁড়াবে তাও বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন। আবদ্ধ বিশ্বের হিসাবটা বেশ সহজ। সূর্য সাদা বামন হয়ে যাবার 3,000 কোটি বছর পর মহাবিশ্বের বিস্তার থেমে যাবে; একটা ভিডিও ছবি উল্টো দিকে চালালে যেমন হয় তেমনি সব কিছু উল্টোভাবে ঘটতে শুরু করবে অর্থাৎ গ্যালাক্সি জোটগুলো সব পরস্পরের কাছাকাছি আসতে শুরু করবে। এভাবে 5,000 কোটি বছর চলার পর আসবে এক সঙ্কটকাল। সব গ্যালাক্সি পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে যাবে; তারপর একটা আরেকটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করবে। বিশাল সব অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে জ্বলে উঠবে অসংখ্য অতি নবতারা আর অতি কোয়াসার। রাতের আকাশ হয়ে উঠবে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল; মহাকাশের তাপমাত্রা বেড়ে হবে তারাদের মতো উষ্ণ। মহাধসের এক লক্ষ বছর আগে মহাবিশ্ব জুড়ে প্রচণ্ড উষ্ণ আর ঘন বস্তুতে অসংখ্য কৃষ্ণবিবর তৈরি হতে আরম্ভ করবে। অবশেষে 8,000 কোটি বছর পর এক পরম ধসে মহাবিশ্বের সব কিছু একাকার হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হবে এক মহা কৃষ্ণবিবর যার ভর হবে সমগ্র মহাবিশ্বের সমান। মহাবিশ্বের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কালের সৃষ্টি হয়েছিল; কাজেই মহাবিশ্বের ইতি ঘটলে স্থান আর কালও উধাও হয়ে যাবে। স্থান-কালহীন সেই মহাবিশ্বে টিকে থাকবে শুধু পরম শূন্যতা।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন এই পরম ধসে সব কিছু যে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে তা নয়, এতে যে শক্তি ছাড়া পাবে তার ফলে ঘটবে আরেক বিস্ফোরণ, সৃষ্টি হবে আরেক মহাবিশ্ব। এভাবে হয়তো ছন্দময় দোলায় একের পর এক নতুন নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতেই থাকবে।

উন্মুক্ত মহাবিশ্ব (Open universe) : যদি ধরা হয় যে মহাবিশ্ব উন্মুক্ত, তা হলে এর চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে ? অতি দীর্ঘ সময় পরে মহাবিশ্বের মূল উপাদান গ্যালাক্সিগুলোর কী অবস্থা হবে ? আমরা জানি, একটি গ্যালাক্সি বহু সংখ্যক নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি নক্ষত্রই সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, আয়ু শেষ হলে নক্ষত্র মারা যায়। এটাই নক্ষত্রের চূড়ান্ত পরিণতি। এই পর্যায়ে পৌঁছার পর নক্ষত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন পরিবর্তন আসে না। যদিও বা হয়, তবে তার জন্য প্রয়োজন হয় অনেক বিলিয়ন বছর।

তিন উপায়ে একটি নক্ষত্রের মৃত্যু হতে পারে। এগুলো হলো—শ্বেত বামন (White dwarf), নিউট্রন তারকা (Neutron star) এবং কৃষ্ণ বিবর (Black hole)। তিনটি পর্যায়েই নক্ষত্রের উপাদানগুলো অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। তবে যে নক্ষত্রে উপাদানগুলো সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত থাকে তাকে কৃষ্ণ বিবর বলে। অনেক সময় পরে একটি গ্যালাক্সির সব নক্ষত্রই মৃত্যুবরণ করবে। কোনো গ্যালাক্সির সব নক্ষত্র মারা যেতে 100 থেকে 1000 বিলিয়ন বছর সময় লাগতে পারে। সে অবস্থায় নক্ষত্রের কোনো উত্তাপ না থাকায় সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি জুড়ে বিরাজ করবে গভীর শীতলতা। তবে সেই অবস্থায়ও গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকবে। তখনও গ্যালাক্সিগুলো একে অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। এই অবস্থায় পৌঁছানোর পর গ্যালাক্সিগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে অনেক বিলিয়ন বছর সময় লাগবে। তখন নক্ষত্রগুলো অন্যান্য নক্ষত্রের সঙ্গে সংঘর্ষের মাধ্যমে গ্যালাক্সি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। ধারণা করা হয় এই প্রক্রিয়ায় গ্যালাক্সির প্রায় 99% মৃত নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর (অনুমান করা যায় 10^{98} বছর বা তারও বেশি সময়) লাগতে পারে। অবশিষ্ট 1% মৃত নক্ষত্রগুলো মিলে একটি অতি ঘন ও অতি সংকুচিত অবস্থা সৃষ্টি করবে। এরা পরস্পর একত্রিত হয়ে একটি অতি ভারী (সূর্যের ভরের প্রায় বিলিয়ন গুণ) কৃষ্ণ বিবর সৃষ্টি করবে। এই কৃষ্ণ বিবরকে সুপার ম্যাসিভ (Super massive) বা দানবীয় কৃষ্ণ বিবর বলা হয়। এই দানবীয় কৃষ্ণ বিবরের পরের অবস্থা কী হতে পারে ! কৃষ্ণ বিবর সাধারণত সবকিছু নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ভারী হতে থাকে। এরপর বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পরের অবস্থা বিবেচনা করলে অনুমান করা হয় যে এই দানবীয় কৃষ্ণ বিবরগুলোও বিকিরণ করতে করতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর মহাবিশ্বে থাকবে শুধু মৃত নক্ষত্রসমূহ এবং গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু যা অন্ধকারময় মহাবিশ্বে অনন্তকাল ধরে ঘুরে বেড়াবে।

সমতল মহাবিশ্ব (Flat universe) : মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব ρ, সংকট ঘনত্ব ρ_c এর সমান হলে ঘনত্ব প্যারামিটার $\Omega = 1$ হয়। সে অবস্থায় মহাবিশ্বের প্রসারণ মহাকর্ষীয় আকর্ষণ অপেক্ষা সামান্য বেশি হবে। ফলে প্রসারণ একেবারে না থেমে খুব ধীরে ধীরে ঘটবে এবং মহাবিশ্বের প্রসারণ অনন্তকাল ধরে ধীর গতিতে চলতে থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রসারণ হবে সোজা পথে এবং স্থান হবে অসীম সমতল; কোনো বক্রতা থাকবে না। এটিই সমতল মহাবিশ্বের ধারণা।

আবদ্ধ মহাবিশ্বের এই হিসাবের তুলনায় সমতল মহাবিশ্ব আর উন্মুক্ত মহাবিশ্বের হিসাব বেশ কিছুটা ধোঁয়াটে। এই দুই মতের শেষ যে ঠিক কীভাবে হবে তা বলা শক্ত; তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে মহাবিশ্ব ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে। আরো বহু হাজার কোটি বছর ধরে গ্যালাক্সিরা তাদের ভেতর ধুলো আর গ্যাসের পাঁজা থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি করে যেতে থাকবে। সূর্যের মতো আকারের তারাদের জীবনকাল মোটামুটি 10^{10} বছর; তবে খুব ছোট যে সব তারা মিটমিটে

আলো দেয় তারা হয়তো এর চেয়ে 10,000 গুণ বেশি দিন (10^{14} বছর) বাঁচবে। অর্থাৎ আজ থেকে 10 লক্ষ কোটি বছর পরে মহাবিশ্বে থাকবে শুধু অতি ছোট আকারের বহু লাল বামন। পৃথিবী যদি সূর্যের লাল দানব পর্যায়ে বাষ্প হয়ে না যায় তবে পৃথিবী থেকে সারা আকাশকে দেখাবে ঘোর কালো। সূর্যের শবদেহ সাদা দানব থেকে ঠান্ডা হতে হতে একটা কালো অন্ধকার পিন্ডে পরিণত হবে, তার চারপাশে হয়তো তখনও ঘুরবে পৃথিবীর ছাইপোড়া দেহ।

এই অবস্থায় পৌঁছাতে নীহারিকার সময় লাগবে 10^{14} থেকে 10^{27} বছর। একদল নীহারিকা শুধু একটি মাত্র কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। তাই 10^{27} বছর পরে সমগ্র বিশ্ব এই নীহারিকা কৃষ্ণ বিবরের সমষ্টিতে পরিণত হবে। তাদের মাঝখানে থাকবে বিশাল শূন্যস্থান যেখানে কতগুলো পথভ্রষ্ট শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র বা কৃষ্ণ বিবর একা একা ভ্রমণ করতে থাকবে [চিত্র ১১·৬]। একটি কৃষ্ণ বিবর চিরস্থায়ী নয় বরং তা সামান্য পরিমাণে বিকিরণ নির্গত করে বহুকাল পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিকিরণতত্ত্বের ভিত্তি আবিষ্কার করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী **এস. ডবলিউ হকিং** (S. W. Hawking) এবং এটা 'হকিং বিকিরণ' (Hawking Radiation) নামে অভিহিত। নীহারিকা কৃষ্ণ বিবর ভরবিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ বিবর বাঁচে প্রায় 10^{65} বছর। নীহারিকা কৃষ্ণ বিবর বহুগুণ বড় এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলো 10^{100} বছর পর্যন্ত বাঁচবে। কৃষ্ণ বিবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বর্তমান বিশ্বে যে নীহারিকাগুলো আছে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ থেকে একশ লক্ষ কোটি বছর পর লাল বামনদের আলোও নিভে যাবে। মহাকাশে তখন আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন বস্তু থাকবে শুধু অসংখ্য তারার শবদেহে; সেসব শবদেহ হলো কৃষ্ণবিবর, নিউট্রন তারা আর কালো বামন। বাকি যে সব গ্রহ-উপগ্রহ গ্রহাণু থাকবে তাদেরও কারো গা থেকে কোনো তেজ বিকিরিত হবে না; সব কিছু থেকে সব তেজ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ক্রমে ক্রমে মহাবিশ্বের সব প্রোটনেরও ক্ষয় হতে থাকবে— অবশ্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটনের ক্ষয় হতে লাগবে প্রায় 10^{32} বছর; তখন শুধু কৃষ্ণবিবর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না । কিন্তু এই কৃষ্ণবিবরও কী অক্ষয়? একদিন তাদেরও ক্ষয় হবে, তবে সে কতদিনে—তার হিসাব কল্পনা করাও কঠিন, হয়তো 10^{63} (অর্থাৎ এক-এর পেছনে 63-টা শূন্য) বছর পর। ততদিনে সেই মহাবিশ্ব জুড়ে থাকবে শুধু এক মহাশূন্যতা। পরম একীভূত তত্ত্ব অনুসারে অথবা মধ্যাকর্ষণ সূত্র এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে প্রোটন চিরস্থায়ী নয় তাই মহাবিশ্বের পরিণতি ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

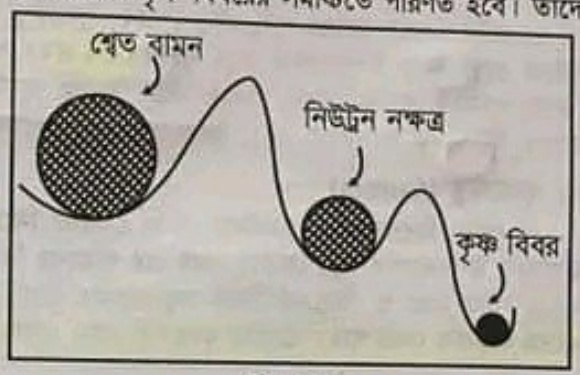

চিত্র ১১·৬

কাজ : মহাবিশ্বের প্রসারণ কত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং কোন সময়ে এই প্রসারণ বন্ধ হবে ?

যদি সংকট ঘনত্বের মান বর্তমান গড় ঘনত্বের বেশি হয় সেক্ষেত্রে প্রসারণ আজীবন চলতে থাকবে। যদি সংকট ঘনত্বের মান বর্তমান গড় ঘনত্বের সমান হয় সেক্ষেত্রে বিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকবে কিন্তু কখনোই একেবারে থেমে যাবে না।

পর্যবেক্ষণমূলক কাজ : মহাবিশ্বে কখন সংকোচন শুরু হবে ?

মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্বের বেশি হয় তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ মহাবিশ্বের প্রসারণকে এক সময়ে থামিয়ে দিয়ে শুরু করবে বিশ্ব জুড়ে মহাসংকোচন।

১১·৩ মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা
Basic materials and events of the universe

আমাদের আবাস ভূমি পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে অসীম আকাশ। আদি অন্তহীন এই আকাশকে বলা হয় মহাকাশ বা নভোমন্ডল। বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও শক্তি যে অঞ্চলে বিন্যস্ত বা ভাসমান তার নাম মহাকাশ। মহাকাশের শুরু বা শেষ নেই। মহাকাশে অসংখ্য **জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ড** অবস্থান করছে, যেমন সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা ইত্যাদি। এদের নাম **জ্যোতিষ্ক** (Luminary)। এরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে। আজকাল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা ছাড়াও অনুজ্জ্বল নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণ বামন, কৃষ্ণ গহ্বর ইত্যাদি সব কিছুকেই জ্যোতিষ্ক বলে। এদের সবাইকে নিয়ে যা গঠিত হয়েছে, তার নামই **মহাবিশ্ব**। নক্ষত্রগুলো হলো **জ্বলন্ত গ্যাস পিন্ড**। এদের নিজের আলো ও উত্তাপ রয়েছে। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন নক্ষত্র বা তারা সৃষ্টি হচ্ছে। পুরাতন

তারা ঠান্ডা হয়ে গেলে এবং নিভে গেলে বিপুল পরিমাণে ধূলি, গ্যাস প্রভৃতি মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ওই উপাদানগুলো থেকে নতুন তারা সৃষ্টি হতে পারে।

এই মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান হলো তিনটি।
(ক) সৌর জগৎ (Solar system), (খ) নক্ষত্রপুঞ্জ (Stars) ও (গ) গ্যালাক্সি (Glaxies)

ক. সৌর জগৎ (Solar system)

সৌর জগতে রয়েছে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহাণুসহ গ্যাস ও ধূলিকণা। সূর্য সৌর জগতের কেন্দ্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে 8টি গ্রহ। আবার গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে উপগ্রহ। সৌর জগতের মধ্যে কেবল সূর্যেরই আলো আছে। সকল গ্রহ, উপগ্রহ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। সৌর জগতে গ্রহ, উপগ্রহ ছাড়া রয়েছে অনিয়মিত আকারের উল্কা, ধূমকেতু, গ্রহাণু, গ্যাস ও ধূলিকণা সহ নানাবিধ কঠিন বস্তু।

(i) ধূমকেতু (Comet)

পানি, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস কোনো নিরেট ক্ষুদ্র শিলা খন্ডের ওপর জমে তৈরি হয় ধূমকেতু। সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় এর সামনের দিকের পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং বিকিরণ চাপে সামনের দিকে একটি স্ফীত মাথা ও পেছনের দিকে সরু লেজের মতো হয়। দেখতে অনেকটা ঝাড়ুর মতো দেখায়। 76 বছর পর পর এদের একবার দেখা যায়। হ্যালির ধূমকেতু এমন একটি ধূমকেতু।

(ii) উল্কা (Meteors)

আকাশে অনেক সময় ছোট আগুনের গোলা ছুটতে দেখা যায়। এরা নক্ষত্র বা তারা নয়। এরা হলো উল্কা। খুব ক্ষুদ্র শিলা খন্ড যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসে তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে প্রচন্ড বেগে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে এবং বায়ুর কণার সাথে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে এবং পৃথিবীতে পতনের আগেই নিভে যায়। ইহাই উল্কা।

খ. নক্ষত্র (Stars)

পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় নক্ষত্রগুলো যেন মহাকাশের একই সমতলে অবস্থান করছে। পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব অনেক বেশি বলে এমনটি মনে হয়। সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 15 কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোকের সময় লাগে 8 মিনিট 19 সেকেন্ড। অন্যান্য নক্ষত্রের দূরত্ব এত বেশি যে তা আলোক বর্ষে প্রকাশ করা হয়। সূর্যে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে। প্রচন্ড তাপে সর্বদা ফিশন বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হতে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই রূপান্তরের সময় ভরের যে পার্থক্য ঘটে তা $E = mc^2$ সূত্রানুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে 4×10^{26} জুল শক্তি বিকিরণ করে। সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস আছে তা থেকে কোটি কোটি বছর আলো ও তাপ পাওয়া যাবে। সূর্য ক্রমশ ভর হারোনার ফলে সংকুচিত হচ্ছে। তবে এই সংকোচন 100 কোটি বছর ধরে চলবে। সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে নির্গত শক্তির পরিমাণকে সৌর ঔজ্জ্বল্য বলে। গাণিতিকভাবে সৌর ঔজ্জ্বল্য $L_s = 4\pi R^2 S$; যেখানে S = সৌর ধ্রুবক = $1\cdot38 \times 10^3$ Wm^{-2}, R = সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যার মান $1\ AU = 1\cdot496 \times 10^{11}$ m বা $9\cdot289 \times 10^7$ মাইল।

(i) নেবুলা বা নীহারিকা (Nebula)

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা নক্ষত্রের জন্ম মহাকাশে ভাসমান বিশাল বিশাল গ্যাস পিন্ড থেকে। এই গ্যাস পিন্ডকে বলা হয় নীহারিকা বা নেবুলা। আকাশের দিকে তাকালে কোথাও কোথাও আবছা আলোর একটা ছোপ দেখা যায়। আবছা আলোর মতো দেখতে আন্তঃনাক্ষত্রিক এ ধুলো ও গ্যাসের মেঘই নীহারিকা। নীহারিকা গ্যাস পিন্ড গড়ে উঠেছে 50 থেকে 75 শতাংশ হাইড্রোজেন ও 20 থেকে 45 শতাংশ হিলিয়াম এবং বাকি 5 শতাংশ অন্যান্য মৌলিক পদার্থ দিয়ে। বেশির ভাগ নীহারিকা তৈরি হয় আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে। সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলেও কোনো কোনো নীহারিকার জন্ম হয়। সুপারনোভার বিস্ফোরণ হচ্ছে বিশাল আকারের নক্ষত্রের মৃত্যু।

গ. গ্যালাক্সি (Galaxies)

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যাসীয় পদার্থের সংকোচন হয় যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির মধ্যেও গ্যাসের মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের ফলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম মিলে তৈরি ঘনীভূত গ্যাসের অণু-পরমাণুর মধ্যে ঘর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয় এবং বিপুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়। নক্ষত্র ও সূর্য এভাবেই জ্বলে ওঠে। অনেকগুলো নক্ষত্রের সমাবেশকে গ্যালাক্সি বলে। আকাশ গঙ্গা নামক ছায়াপথে আমরা বাস করি। এই ছায়াপথে প্রায় 10^{11} সংখ্যক নক্ষত্র রয়েছে। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে আলফা সেন্টোরাই এর দূরত্ব 4·3 আলোক বর্ষ। অ্যানড্রোসিডা এক ধরনের সর্পিল গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সি দুই ধরনের। যথা— (১) স্বাভাবিক গ্যালাক্সি ও (২) রেডিও গ্যালাক্সি।

গ্যালাক্সির নাম	গঠন
১। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি	১। লোহিত দানব ও শ্বেত বামন নক্ষত্র নিয়ে গঠিত।
২। সর্পিল গ্যালাক্সি	২। ছায়াপথ ও অ্যানড্রোমিডা এ ধরনের গ্যালাক্সি।
৩। বিষম গ্যালাক্সি	৩। নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই।
৪। রেডিও গ্যালাক্সি	৪। রেডিও কম্পাঙ্কের তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ নিঃসরণ করে।

(i) ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য বস্তু (Dark matter)

গ্যালাক্সিতে বিপুল পরিমাণ ভর রয়েছে যা মহাকর্ষ বল সরবরাহ করে কিন্তু কোনো তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ নিঃসরণ না করায় তা দৃশ্যমান হয় না, এদেরকেই অদৃশ্য ভর বা ডার্ক ম্যাটার বলে। ধারণা করা হয় গ্যালাক্সিতে অদৃশ্য ভরের পরিমাণ দৃশ্যমান ভরের প্রায় দশগুণ।

(ii) কোয়াসার :

এটি আধা নাক্ষত্রিক (quasi-stellar) রেডিও উৎস। এদের গঠন নক্ষত্রের ন্যায় এবং এরা ক্ষমতাশীল বেতার তরঙ্গ নিঃসরণ করে। এদের ঘনত্ব অনেক বেশি। এ পর্যন্ত প্রায় 150টি কোয়াসার শনাক্ত করা হয়েছে। এরা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এরা পৃথিবী থেকে $0.9\,c$ বেগে সরে যাচ্ছে।

১১.৪ মৌলিক কণা
Fundamental particles

মহাবিশ্ব দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। বিশ্বজগতের সমস্ত প্রকার জড় পদার্থ মৌলিক কণার সমন্বয়ে গঠিত। জানা তত্ত্ব মোতাবেক মৌলিক কণার অভ্যন্তরীণ গঠন নেই। এই সকল কণা পরম আদি বা প্রাথমিক এবং অবিভাজ্য কণা। এ সকল কণা 1 বা 0 (শূন্য) আধান যুক্ত। মৌলিক কণিকাসমূহ দুই ধরনের :

১। কণা (Particle)
২। প্রতিকণা (Antiparticle)

এমন অনেক কণিকা আছে যার ভর, স্পিন অন্য কণিকার সমান কিন্তু চার্জ, বেরিয়ন সংখ্যা, লেপটন সংখ্যা অন্য কণিকার সমান কিন্তু বিপরীতধর্মী। এগুলোকে প্রতি কণা বলে। কোনো কণার প্রতিকণার ভর ওই কণাটির ভরের সমান কিন্তু চার্জ সমমানের হলেও বিপরীতধর্মী। চার্জ ও চৌম্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা ও প্রতিকণা একই রকম। সকল বিক্রিয়ায় এদের চার্জ, ভরশক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। ফোটন ও মেসন ছাড়া সকল কণিকার প্রতিকণা আছে। কণা ও প্রতিকণা একত্রিত হলে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ পরমাণুতে এই ঘটনা ঘটে না। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাক ইলেকট্রনের বিপরীত কণা পজিট্রন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

মহাবিশ্বের সকল কণাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—১। ফার্মিয়ন ২। বোসন। যে সকল কণা ফার্মিয়ন সেগুলোকে বলা হয় বস্তুকণা। আর যেগুলো বোসন সেগুলো এই বস্তুকণার ভিতরে বল বা শক্তির আদান-প্রদান করে।

১। **ফার্মিয়ন (Fermion) :** মহাবিশ্বের সকল পদার্থই ফার্মিয়ন কণিকা দিয়ে তৈরি। এই কণা ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান মেনে চলে, এদের স্পিন $\frac{1}{2}$ এরা পাউলির বর্জনীতি মেনে চলে। অর্থাৎ একটি পরমাণুতে দুটি কণার সকল বৈশিষ্ট্য কখনোই এক হতে পারে না। প্রতিটি ফার্মিয়ন কণার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকণা আছে। ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামানুসারে এই কণার নামকরণ করা হয়েছে। ফার্মিয়ন আবার দুই ধরনের—ক) কোয়ার্ক খ) লেপটন।

ক) **কোয়ার্ক (Quark) :** ষাটের দশকের কতকগুলো পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে প্রোটন, নিউট্রন, মেসন ইত্যাদি অর্থাৎ হ্যাড্রন আরো ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি। 1961 সালে জ্যোতির্বিদ মারে গেল-ম্যান (Murray Gell-mann) ও ইউভাল নে'ম্যান (Yuval Ne'eman) এই ক্ষুদ্র কণাগুলোর নাম দেন কোয়ার্ক। কোয়ার্ক মৌলিক কণা। মৌলিক কণা কোয়ার্কের সংযোগের ফলে হ্যাড্রনের সৃষ্টি হয়। কোয়ার্ক মডেলের জন্য 1969 সালে গেল-ম্যান নোবেল পুরস্কার পান।

এ পর্যন্ত ছয় ধরনের কোয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের বলা হয় আপ (u for up), ডাউন (d for down), স্ট্রেঞ্জ (s for strange), চার্ম (c for charm), টপ (t for top) ও বটম (b for bottom)। কোয়ার্কের চার্জ ভগ্নাংশিক অর্থাৎ ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের ভগ্নাংশ পরিমাণ। প্রতিটি কোয়ার্কের বেরিয়ন সংখ্যা $\frac{1}{3}$। কিন্তু এরা এমনভাবে দলবদ্ধ থাকে যে এদের মোট চার্জ ও বেরিয়ন সংখ্যা 0 বা 1 হয়। সকল কোয়ার্কই ফার্মিয়ন যাদের স্পিন $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ..... । দুটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক মিলে প্রোটন এবং দুটি ডাউন কোয়ার্ক ও একটি আপ কোয়ার্ক মিলে নিউট্রন গঠিত হয়।

হ্যাড্রন কণা : হ্যাড্রন হচ্ছে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত অতিপারমাণবিক বা সাবঅ্যাটমিক কণা। প্রোটন, নিউট্রন, পাইয়ন, মেসন—এ সকল ভারী কণা হলো হ্যাড্রন। অর্থাৎ যে সকল মৌলিক কণা শক্তিশালী নিউক্লীয়, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় এই তিন ধরনের প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে তাদেরকে হ্যাড্রন কণা বলে। হ্যাড্রন কণা আবার দুই ধরনের। যথা—(১) মেসন ও বেরিয়ন। মেসনের স্পিন 0 (শূন্য), কিন্তু বেরিয়নের স্পিন শূন্য নয়।

(খ) লেপটন কণা (Lepton) : লেপটন কণা হলো সর্বাপেক্ষা হালকা মৌলিক কণা। এ সকল কণা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু কখনও শক্তিশালী নিউক্লীয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এদের স্পিন $\frac{1}{2}$ এবং জীবনকাল অসীম। লেপটন কণা আবার তিন ধরনের—(১) ইলেকট্রন গোষ্ঠীয় লেপটন, (২) মিওন গোষ্ঠীয় লেপটন, (৩) টাউ গোষ্ঠীয় লেপটন। ইলেকট্রন হলো উল্লেখযোগ্য লেপটন কণা। এই কণাগুলো হলো ইলেকট্রন, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউয়ন, মিউয়ন নিউট্রিনো, টার্ড এবং টার্ড নিউট্রিনো।

(২) বোসন (Boson) : ফার্মিয়ন কণা অর্থাৎ লেপটন ও কোয়ার্ক দ্বারা এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থ তৈরি হয় তার এদের মধ্যে বল বা শক্তির আদান-প্রদান করে বোসন কণা। এই সকল কণার স্পিন পূর্ণ অখণ্ডক এবং এরা বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন বোসের নামানুসারে এই কণার নামকরণ করা হয়। যেসকল মৌলিক কণার স্পিন পূর্ণ অখণ্ডক তাদেরকে বোসন বলে।

ফার্মিয়ন কণিকা অর্থাৎ লেপটন ও কোয়ার্ক দ্বারা এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থ তৈরি হয় এবং এদের মধ্যে বল বা শক্তির আদান-প্রদান করে বোসন কণা। বোসন কণা দুই ধরনের—(ক) গেজ বোসন (খ) হিগস বোসন।

(ক) গেজ বোসন : ফোটন, W বোসন (W^+, W^-), Z বোসন, গ্লুন, গ্রাভিটন কণা হলো গেজ বোসন। গ্রাভিটন কণার স্পিন $2\hbar$ এবং ফোটন, বোসন, গ্লুন কণার স্পিন $1\hbar$, W বোসনের চার্জ ± 1 এবং অন্য সকল বোসন কণার চার্জ শূন্য (0)।

(খ) হিগস বোসন : হিগস বোসন ক্ষেত্রনামক তাত্ত্বিক বল ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। ভরহীন কোনো কণা এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা ধীরে ধীরে ভর লাভ করে। ফলে চলার গতি হ্রাস পায়। এই ক্ষেত্রের মাধ্যমেই ভর কণাতে স্থানান্তরিত হয়। হিগস বোসনের ভর আছে এবং এর চার্জ ও স্পিন শূন্য (0)। এর সংকেত H^0। ১৯৬৪ সালে পিটার হিগস এবং তাঁর পাঁচ সহযোগী মিলে সর্বপ্রথম এই কণা সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রদান করেন। ২০১৩ সালে সুইজারল্যান্ডের CERN গবেষণাগারের Large Hadron Collidor (LHC) যন্ত্রে এই কণার অস্তিত্ব ধরা পরে। এ বছরেই পিটার হিগস ও ফ্রানকোসিস এঙ্গালাগ এই কণার অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৯৩ সালে হিগস কণাকে ঈশ্বর কণা বা God Particle নামে অভিহিত করা হয়। ফোটন, গেজ বোসন এবং গ্রাভিটন-এর সমন্বয়ে ক্ষেত্রকণা গঠিত। এরা যথাক্রমে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং মহাকর্ষ পরিক্রিয়া বাহক কণা।

ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

কণার নাম ও চিহ্ন	ভর kg বা amu	আধানের প্রকৃতি ও পরিমাণ (কুলম্ব)	কণার ব্যাসার্ধ (মিটার)	তড়িৎ ক্ষেত্রের অবস্থান	চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব	ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ক্রিয়া
ইলেকট্রন (e) [e^0]	$9{\cdot}11 \times 10^{-31}$ kg = 0·000549 amu	$-1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ C	$2{\cdot}8 \times 10^{-15}$	পরমাণুর কেন্দ্রের বাহিরে বিভিন্ন কক্ষে	তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। গতিশীল অবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়	এর ক্রিয়া আছে
প্রোটন (p) [H^1]	$1{\cdot}6725 \times 10^{-27}$ kg = 1·0076 amu	$1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ C	$1{\cdot}2 \times 10^{-15}$	পরমাণুর কেন্দ্রে	"	এর ক্রিয়া আছে
নিউট্রন (n) [$_0n^1$]	$1{\cdot}675 \times 10^{-27}$ kg = 1·0087 amu	শূন্য	$1{\cdot}2 \times 10^{-15}$	পরমাণুর কেন্দ্রে	তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনো প্রভাব নেই	এর ক্রিয়া নেই

১১.৫ নক্ষত্রের জীবন কাহিনী
Life history of stars

ক. নক্ষত্রের জন্ম
Birth of a star

রাতের বেলায় পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য আলোক বিন্দু মিট মিট করে জ্বলতে দেখা যায়। এদেরকে নক্ষত্র বলে। খালি চোখে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। নক্ষত্র হলো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড যা গ্যাস এবং ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত। ধারণা করা হয় যে, এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি। নক্ষত্র সৃষ্টির আদিতে মহাকাশের বিস্তৃত বিশাল অঞ্চল জুড়ে শীতল হাইড্রোজেন, হিলিয়ামসহ অন্যান্য গ্যাসের পরমাণু ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিল। একে গ্যাসের ধূলিমেঘ (dust cloud) বলে। ধূলিমেঘে প্রায় 75% হাইড্রোজেন, 24% হিলিয়াম এবং কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেনসহ অন্যান্য গ্যাস 1% ছিল। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ধূলি কণা ও গ্যাসের বিশাল মেঘ সংকুচিত হয়। সংকোচনের সময় উচ্চ চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যখন কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি হয় তখন তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং বিপুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়। ফলে পদার্থের গোলকটি দীপ্তি ছড়ায়। এই অবস্থা বা ধাপকে বলা হয় নক্ষত্রের জন্ম। নক্ষত্র বিবর্তনের এটি হলো প্রথম ধাপ। বামন নক্ষত্র এই ধাপে থাকে। সূর্যও বর্তমানে এই ধাপে আছে। মোট নক্ষত্রের ৯০ ভাগ হলো এই বামন নক্ষত্র (dwarf star)।

আমরা জানি পরমাণু নিরপেক্ষ এবং এদের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নেই। এদের মধ্যে একমাত্র ক্রিয়াশীল বল হলো মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যাস পরমাণুর মেঘ আস্তে আস্তে জমাট বাঁধতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু গ্যাস পরমাণুর মধ্যকার গড় দূরত্ব কমতে থাকে, সুতরাং এদের স্থিতিশক্তিও কমতে থাকে। শক্তির নিত্যতা বজায় রাখার জন্য এদের গতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ে। গতিশক্তি বৃদ্ধি এবং সংঘর্ষের কারণে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। মহাকর্ষ বলের টানে এই ধূলিমেঘ যত সঙ্কুচিত হতে থাকে তত অধিক সংখ্যক পরমাণু কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে কেন্দ্রের নিকটবর্তী অংশের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা উভয়ই বাইরের অংশের তুলনায় দ্রুত বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এই গ্যাসপিণ্ড থেকে বিকিরণ শক্তির পরিমাণও বাড়তে থাকে এবং গ্যাসপিণ্ড থেকে অনুজ্জ্বল আলো নির্গত হয়। এভাবে গ্যাসপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধিও অব্যাহত থাকে। তাপমাত্রা বেড়ে যখন 10^7 K-এ পৌঁছায় তখন নিউক্লীয় ফিউশন (nuclear fusion) বিক্রিয়া শুরু হয়। এই ফিউশন বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। এর ফলে গভীর বহিঃচাপের সৃষ্টি হয়। বিকিরণ থেকে সৃষ্ট এই বহিঃচাপ মহাকর্ষের সঙ্কোচনকে বাধা প্রদান করে। যখন বহির্চাপ এবং সঙ্কোচন বল সমান হয় তখন সুস্থিত (stable) বা সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়। এভাবে একটি তারকা পূর্ণতা এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। অবশ্য এ ধরনের ধ্বংসোন্মুখ গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘপুঞ্জ থেকে একটি মাত্র জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তৈরি না হয়ে শত শত তারকার সমন্বয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সাথে নক্ষত্রপুঞ্জের আকার বাড়তে থাকে এবং নক্ষত্রগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক সময়ে এরা স্বতন্ত্র তারকা বা নক্ষত্র হিসেবে দূরে সরে যায়। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কোটি কোটি বছর লাগে। আমাদের সূর্যও সম্ভবত এভাবেই নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছে আজ থেকে 500 কোটি বছর আগে। ১১.৭ চিত্রে সূর্যের গঠন দেখানো হলো।

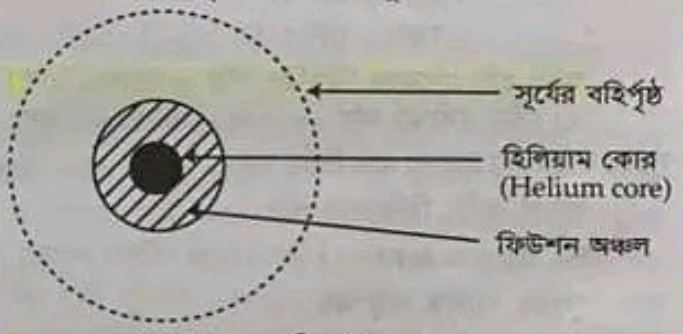

চিত্র ১১.৭

হিসাব : একই পরম ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট 2টি তারার মধ্যে একটি অপরটি থেকে 1000 গুণ দূরে অবস্থিত। এদের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য কত হবে ? কোনটির ঔজ্জ্বল্য বেশি হবে ?

আমরা জানি, $m_2 - m_1 = 5 \log \frac{d_2}{d_1} = 5 \log \left(\frac{1000\, d_1}{d_1} \right)$

$= 5 \log 10^3 = 15$

$\therefore \quad m_2 = 15 + m_1$

অর্থাৎ তারাদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য হবে 15 একক। ঔজ্জ্বল্যের স্কেল কম ঔজ্জ্বল্যের সাংখ্যিক মান বেশি হওয়ার কারণে দূরবর্তী তারার ঔজ্জ্বল্য 15 একক বেশি হবে।

সূর্যের শক্তির উৎস

সূর্য একটি বিশাল নক্ষত্র। সূর্যকে বলা হয় শক্তির আধার। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে 4×10^{26} জুল শক্তি বিকিরণ করে। এই বিপুল শক্তি সূর্য পায় নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া থেকে। সূর্যের ভেতর অতি উচ্চ তাপমাত্রার কারণে চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজিত (fused) হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$4\,{}_1^1H \longrightarrow {}_2^4He + 2\,{}_1^0n + \text{শক্তি}$$

সৌর ঔজ্জ্বল্য : সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে চতুর্দিকে নির্গত শক্তির পরিমাণকে সৌর ঔজ্জ্বল্য বলে। একে L_s দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$L_s = 4\pi R^2 \times s$

এখানে, s = সৌর ধ্রুবক $= 1.38 \times 10^3\ Wm^{-2}$; R = সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ $= 1\ AU = 1.496 \times 10^{11}\ m$

গাণিতিক উদাহরণ ১১.২

১। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে ? [দি. বো. ২০১৫]

আমরা জানি, বিকিরণের শক্তি,

$L_s = 4\pi R^2 \times s$

$\therefore L_s = 4 \times 3.14 \times (1.496 \times 10^{11})^2 \times 1.38 \times 10^3$

$= 3.879 \times 10^{26}\ W$

$= 3.879 \times 10^{26}\ Js^{-1}$

এখানে,

R = পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ $= 1.496 \times 10^{11}\ m$

s = সৌর ধ্রুবক $= 1.38 \times 10^3\ Wm^{-2}$

অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে বিকিরিত শক্তি $= 3.879 \times 10^{26}\ J$

২। সৌর ধ্রুবকের মান $s = 1.38 \times 10^3\ Wm^{-2}$ এবং সূর্য হতে পৃথিবীর গড় দূরত্ব 1.5×10^8 km। প্রতি বছর সূর্যের ভরের গড় হ্রাসের হার নির্ণয় কর।

আমরা জানি, বিকিরণের শক্তি,

$L_s = 4\pi R^2 \times s$

সুতরাং, বার্ষিক শক্তি ক্ষয়,

$\Delta E = 4\pi R^2 \times s \times 24 \times 60 \times 60 \times 365$

আবার, $\Delta E = \Delta mc^2$

$\therefore$ বার্ষিক ভর হ্রাসের হার,

$$\frac{\Delta E}{c^2} = \frac{4\pi R^2 \times s \times 24 \times 60 \times 60 \times 365}{(3 \times 10^8)^2}$$

$$= \frac{4 \times 3.14 \times (1.5 \times 10^{11})^2 \times 24 \times 60 \times 365 \times 60 \times 1.38 \times 10^3}{9 \times 10^{16}}$$

$$= \frac{4 \times 3.14 \times 1.5 \times 1.5 \times 2.4 \times 36 \times 3.65 \times 1.38 \times 10^{22} \times 10^5 \times 10^3 \times 10^{-16}}{9}$$

$= 1366.5 \times 10^{14}\ kg = 1.37 \times 10^{17}\ kg$

এখানে,

s = $1.38 \times 10^3\ Wm^{-2}$

R = $1.5 \times 10^8\ km = 1.5 \times 10^{11}\ m$

ভর হ্রাসের হার, $\Delta m = ?$

৩। সূর্যের ভর 1.99×10^{30} kg। একটি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 6 গুণ। এটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে এর ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [দি. বো. ২০১৫]

ধরা যাক, ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ $= R_s$

আমরা জানি,

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

$$\therefore R_s = \frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 6 \times 1.99 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2}$$

$= 17.70 \times 10^3\ m = 17.70\ km$

এখানে,

M = নক্ষত্রের ভর $= 6 \times$ সূর্যের ভর

$= 6 \times 1.99 \times 10^{30}\ kg$

c = আলোর বেগ $= 3 \times 10^8\ ms^{-1}$

G = $6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$

৫. নক্ষত্রের মৃত্যু
Death of a star

যদিও একটি নক্ষত্রের সুস্থিত বা সাম্যাবস্থা কোটি কোটি বছর ধরে চলবে, তবুও প্রশ্ন জাগে যখন হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে তখন কী ঘটবে ? চিত্র ১১·৮-এ একটি হিলিয়াম কোর বা মূল অংশ এবং এর বাইরে হাইড্রোজেনের আবরণ দেখান হয়েছে। কোরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি; কিন্তু বাইরাবরণের তাপমাত্রা মাত্র কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও হাইড্রোজেন আবরণ বাইরে রয়েছে; কিন্তু তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি না হওয়ায় ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে না। ফিউশন বিক্রিয়া বন্ধ হলে কোর (core)-এ উৎপন্ন বহির্মুখী চাপ কমতে থাকে এবং মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের কারণে সঙ্কোচন বাড়তে থাকে। অর্থাৎ আকর্ষণ বল প্রাধান্য লাভ করে এবং কোরের সংকোচন চলতে থাকে।

যে সমস্ত নক্ষত্র কম ভরের সেগুলোর হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে সংকোচনের ফলে মূল অংশের ঘনত্ব বাড়ে এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় এবং বহির্ভাগে প্রসারণ ঘটে। তবে মূল অংশের তাপমাত্রা এতটা বাড়ে না যে হিলিয়াম ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। বাইরের আবরণ স্ফীতির ফলে তারকার আকার অনেক বড় হয় এবং তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় তারকার পৃষ্ঠ থেকে নির্গত বিকিরণ লালচে দেখায়। এই তারকাকে রক্তিম দৈত্য (red giant) বলে। এরপর এটি এমন একটি ধাপে পৌঁছায় যে এর বাইরের আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায়। অবশিষ্ট যা থাকে তাকে শ্বেত বামন (white dwarf) বলে। সময়ের সাথে শ্বেত বামন নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা কমতে কমতে একসময়ে কালো বামন (black dwarf) হয় এবং এর মৃত্যু ঘটে।

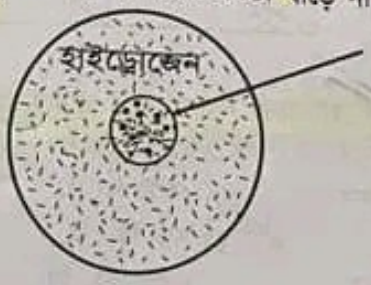

চিত্র ১১·৮

তবে যে সমস্ত তারকার ভর অনেক বেশি সেগুলোতে মহাকর্ষ আকর্ষণ বলের ফলে মূল অংশের সংকোচন বেশি হয় এবং তাপমাত্রাও অনেক বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যখন 10 কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়। এক্ষেত্রে তিনটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করে এবং আকর্ষণ বলকে প্রতিহত করে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। তবে কোরের ভেতরের চাপ বৃদ্ধির প্রভাব বাইরের আবরণে বিস্তার লাভ করে এবং আবরণেরও প্রসারণ ঘটতে থাকে। অর্থাৎ তারকার আকারও বেড়ে যায় এবং উজ্জ্বলতাও বাড়ে। একটি পূর্ণ তারকার চেয়ে শতগুণ বড় হয়ে সুস্থিত (stable) অবস্থায় আসে। বহিরাবরণের প্রসারণের ফলে তাপমাত্রা কমে যায় এবং তারকা লালচে দেখায়। এ অবস্থায় বা ধাপের তারকাকে বলা হয় **রক্তিম দৈত্য বা অতি রক্তিম দৈত্য তারকা** (red giant or super giant star)। সূর্য যখন হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ করে এই ধাপে পৌঁছাবে তখন সূর্যের আকার এতটা বেড়ে যাবে যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং এমনকি মঙ্গলগ্রহও গ্রাস করে ফেলবে। অবশ্য এই অবস্থা সৃষ্টি হতে এখনও 600 কোটি বছর দেরি আছে।

তারকার আকার যদি আরও বড় হয়, তবে হিলিয়াম শেষ হলে কার্বন এবং অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহার করে লৌহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো রক্তিম দৈত্য অবস্থার পরে কী ঘটবে ? এর পরের অবস্থাই শ্বেত বামন (white dwarf) অবস্থা যা আগেই বলা হয়েছে। আমরা শ্বেত বামন অবস্থাকে নক্ষত্রের অন্তিম অবস্থা হিসেবে ভাবতে পারি।

ভিন্ন ভিন্ন ভরের তারকা ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে। কম বা মাঝারি ভরের নক্ষত্র হাইড্রোজেন জ্বালানি বিশেষ করে তুলনামূলকভাবে বেশ নীরবেই মৃত্যুবরণ করে। এদের জীবনচক্রে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো বাইরের আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নেবুলা (Nebula) শ্রেণির গ্রহ সৃষ্টি। কিন্তু সূর্যের ভরের তুলনায় অনেক ভারী নক্ষত্রগুলো জ্বালানি শেষ হলে সঙ্কোচন অত্যন্ত তীব্র হয় এবং মূল অংশের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। **এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণকে বলা হয় সুপারনোভা (supernova) বিস্ফোরণ।** 1054 খ্রিস্টাব্দে চীনা জ্যোতির্বিদরা এই ধরনের সুপারনোভা বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেন যা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত দিনের বেলায়ও প্রজ্বলিত অবস্থায় দেখা গেছে। এই বিস্ফোরণে বহিরাবরণ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং মূল অংশ অবশিষ্ট থাকে মাত্র। অবশিষ্ট এই মূল অংশের ভর অনুসারে কোনোটি নিউট্রন তারকা (neutron star) আবার কোনোটি কৃষ্ণ বা কাল বিবর (black hole)-এ পরিণত হয়। একটি তারকার যদি যথেষ্ট ভর ও ঘনত্ব থাকে তাহলে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হবে যে, আলো সেখান থেকে নির্গত হতে পারে না। সেই তারকার পৃষ্ঠ থেকে নির্গত আলো বেশি দূরে যাওয়ার আগেই তারকাটির মহাকর্ষীয়

আকর্ষণ তাকে পেছনে টেনে নিয়ে আসবে। ওইসব তারকা থেকে আলো আসতে পারে না বলে আমরা এদের দেখতে পাই না। এই সমস্ত বস্তু পিণ্ডকে কৃষ্ণবিবর বা কৃষ্ণগহ্বর বলে।

কাজ : একটি নক্ষত্রের মৃত্যু কীভাবে হবে ?

জেনে রাখ : লাল দানব তারা কীভাবে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হচ্ছে তা লক্ষ কর। এদের ব্যাস কীভাবে সংকুচিত হচ্ছে তা নিচের চিত্রে দেখ।

চিত্র ১১.৯

সবচেয়ে ছোট তারা সবচেয়ে বড় তারার চেয়ে দশ কোটি ভাগ ছোট। তারার ভর 1 সূর্য ভর হলে বিভিন্ন তারার ব্যাস কত হবে ?

লাল দানব	:	14 কোটি কি. মি.
সূর্য	:	14 লক্ষ কি. মি.
সাদা বামন	:	13 হাজার কি. মি.
নিউট্রন তারা	:	16 কি. মি.
ব্ল্যাক হোল	:	2·5 কি. মি.

সুতরাং তারকার মৃত্যু পর্ব কয়েকটি ধাপে ঘটতে পারে। এই ধাপগুলো নির্ভর করে মৃত্যু পর্ব শুরুর সময়ের ভর অনুসারে। যৌবন পর্বের ভর বিবেচনা করা হয় না এ কারণে যে তারকা রক্তিম দৈত্য হিসেবে, অথবা সুপারনোভার মধ্যে কিংবা নেবুলা গ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে ভর হারায়। ধাপগুলো হলো—

১। যে সমস্ত তারকার ভর সূর্যের ভর (M_0) অপেক্ষা 1·4 গুণ কম সেগুলো শ্বেত বামন (white dwarf) হবে। শ্বেত বামন আস্তে আস্তে তাপীয় শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে স্তিমিত হয়ে কালো বামন (black dwarf) হবে এবং জীবন চক্র শেষ করবে।

২। যে সমস্ত তারকার ভর 1·4 Mo (Mo হলো সূর্যের ভর) এবং 3 Mo-এর মধ্যে সেগুলো নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে। এই অবস্থায় এটি সংকোচনের সময় বহিস্থ আস্তরণ ছুড়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে যায় এবং সুপারনোভায় পরিণত হয়।

৩। যে সমস্ত তারকার ভর 3 Mo-এর চেয়ে বেশি সেগুলো কালো বিবর (black hole)-এ পরিণত হবে।

ওপরে বর্ণিত তিনটি ধাপের তারকাগুলোর যৌবনকালীন ভর হয়ত অনেক বেশি থাকতে পারে। তারপর মৃত্যু পর্ব শুরুর আগে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তারকা ভর হারাতে বা কমাতে পারে। যদি কোনো তারকা যৌবনকালীন ভর কমাতে না পারে এবং মৃত্যুপর্ব শুরুর মুহূর্তে 1·4 Mo-এর বেশি ভর থাকে, তবে কোনো ভাবেই এটি শ্বেত বামন হতে পারবে না। এই 1·4 Mo ভরের সীমাকেই **চন্দ্রশেখর সীমা** (Chandrasekhar limit) বলে। চন্দ্রশেখরের আগে জ্যোতির্পদার্থবিদদের ধারণা ছিল যে সকল ভরের নক্ষত্রই শ্বেত বামন হিসেবে জীবন চক্র শেষ করবে। কিন্তু ভারতীয় বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ চন্দ্রশেখর গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখান্ যে 1·4 Mo ভরের বেশি ভরের কোনো নক্ষত্র শ্বেত বামন হবে না।

নিউট্রন তারকা
Neutron star

সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর মূল অংশের ভর যদি 1·4 Mo-এর বেশি এবং 3 Mo-এর কম হয় তবে মহাকর্ষজনিত কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ বলের জন্য মূল অংশ এতটা সঙ্কোচিত হয় যে ইলেকট্রন ও প্রোটন নিম্নের বিক্রিয়ায় নিউট্রন গঠন করে।

$$p^+ + e^- \longrightarrow n + \gamma$$

এভাবে নিউট্রন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সঙ্কোচনের ফলে মূল অংশের ঘনত্ব যখন 10^{19} kg/m^3 মানে পৌঁছায় তখন নিউট্রনের অধঃক্ষয় হয় (neutron is degenerated) এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে নিউট্রন কঠিন পদার্থের

দেওয়ালের মতো আচরণ করে। এই অবস্থায় নিউট্রন সঙ্কোচন প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করে। অর্থাৎ নিউট্রন গ্যাস বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করে এবং এই চাপের দ্বারা মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকে প্রতিহত করে সুস্থিত (stable) অবস্থায় আসে। একেই নিউট্রন তারকা বলে। চিত্র ১১·১০-এ একটি 1·4 Mo ভরের বেশি নিউট্রন তারকার কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের সাপেক্ষে দেখানো হয়েছে। নিউট্রন তারকাটির ভর সূর্যের ভরের চেয়ে 1·4 গুণের বেশি হলেও এর ব্যাসার্ধ মাত্র 16 km (সূর্যের ব্যাসার্ধ 7,00,000 km)। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে নিউট্রন তারকা দ্রুত ঘূর্ণন গতিসম্পন্ন এবং এর অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। নিউট্রন তারকা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বেতার স্পন্দন (radio pulse) পাওয়া যায়। তাই একে পালসার (pulsar) বলে।

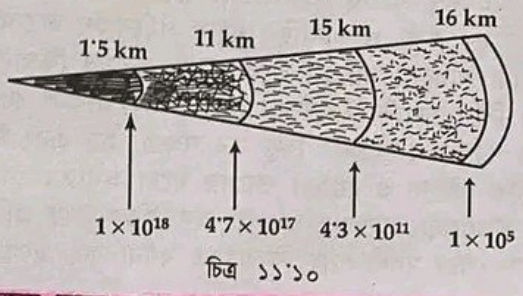

চিত্র ১১·১০

কৃষ্ণ বিবর
Black hole

জন হুইলার কৃষ্ণ বিবর আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে একটি নক্ষত্রের মৃত্যু পূর্ব ভর 3 Mo-এর বেশি হলে নক্ষত্রটির ভেতরে মহাকর্ষ বলের কারণে সঙ্কোচন ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের জানামতে এমন কোনো শক্তি নেই যে এর অব্যাহত সঙ্কোচন প্রতিহত করতে পারে। এভাবে সংকোচিত হয়ে এটি শূন্য ব্যাসার্ধ এবং অসীম ঘনত্বের বিন্দু বস্তুতে পরিণত হতে পারে। বস্তুটি বিন্দু হোক বা না হোক এর আকর্ষণ বল এত বৃদ্ধি পাবে যে এর আশেপাশে থেকে কোনো কিছুই এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারবে না। **বস্তুটি এবং এর আশেপাশে যে অঞ্চল থেকে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়, যেখান থেকে আলো বা কোনো বস্তু বেরিয়ে আসতে পারে না ওই অঞ্চলকে কৃষ্ণ বিবর বা গহ্বর (black hole) বলে।** এই অঞ্চলের সীমাকেই বলা হয় ঘটনা দিগন্ত (Event horizon)। কার্ল শোয়ার্জশিল্ড (Karl Schwarzchild) আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে 1916 খ্রিস্টাব্দে কালো বিবরের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ R_s-এর রাশিমালা নির্ণয় করেন

$$R_s = \frac{2GM}{c^2};$$ এখানে M হলো বস্তুর ভর, c আলোর বেগ এবং G মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

অর্থাৎ M ভরবিশিষ্ট অঘূর্ণনশীল কোনো গোলকীয় বস্তুর ব্যাসার্ধ যদি R_s হয় তাহলে কোনো বিন্দুই এই বস্তুপৃষ্ঠ হতে মুক্ত হতে পারবে না এবং বস্তুটি কৃষ্ণবিবর হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে R_s ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে কৃষ্ণবিবরের মহাকর্ষ আকর্ষণ দ্বারা আটকা পড়বে এবং বস্তুটি থেকে মুক্ত হতে পারবে না এবং বস্তুটি কৃষ্ণ বিবর হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে R_s ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে কৃষ্ণবিবরের মহাকর্ষ আকর্ষণ দ্বারা আটকা পড়বে এবং তা কোনো দিনই মুক্ত হতে পারবে না।

তাঁর নামানুসারে এই ব্যাসার্ধ **শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ** বলে পরিচিত। একে **সংকট ব্যাসার্ধও** বলা হয়। এই ব্যাসার্ধ শুধুমাত্র বস্তুটির ভরের ওপর নির্ভর করে। 5 Mo ভরের একটি কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ হবে প্রায় 15 km। অর্থাৎ 15 km ব্যাসার্ধের ভেতরে কোনো কিছুই দেখা যাবে না এবং আলোসহ কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তবে কৃষ্ণ বিবরের উপস্থিতি অনুভব করা যাবে। সূর্য যদি বর্তমান আকার থেকে সঙ্কোচনের মাধ্যমে 3 km ব্যাসার্ধে পৌঁছায় তবে এটি আমাদের কাছে অদৃশ্য মনে হবে। কিন্তু এর অভিকর্ষীয় প্রভাব থেকে যাবে। যেমন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখনও ঘুরবে। "Seeing is believing" এই প্রবাদ তখন খাটবে না। তবে সূর্য কৃষ্ণ বিবর হবে না কেননা এর ভর অনেক কম।

1974 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **স্টিভেন হকিং** (Stephen Hawking) তত্ত্বীয় ভাবে দেখান যে কৃষ্ণ বিবর কণা নির্গমনের উৎস হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কৃষ্ণ বিবরে যে সমস্ত বস্তু পতিত হয় সেগুলো আবার মহাবিশ্বের অন্য কোথাও বা অন্য কোনো মহাবিশ্বে আবির্ভূত হয়। একে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনার কথাও অনেকে বলেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিবর আগামী দিনের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অনেক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে নিঃসন্দেহে।

জানার বিষয় : I. জন হুইলার কৃষ্ণ বিবর আবিষ্কার করেন। এর ঘনত্ব অসীম।
II. গ্রহানু মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মাঝ দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

হিসাব কর : একটি নক্ষত্রের ভর $6M_0$। নক্ষত্রটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ কত হবে ? [সূর্যের ভর, $M_0 = 1·99 \times 10^{30}$ kg]

১১·৬ মহাকাশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রের মূলনীতি

Principles of the instruments used for observing the space

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য এবং মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। এছাড়া মহাবিশ্বে অবস্থিত মূল বস্তু ও নানাবিধ ঘটনা পর্যবেক্ষণ তাদের গতিবিধি অবলোকন এবং গঠন পর্যালোচনা ও প্রকৃতি জানতে বিজ্ঞানীরা অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যেসব বিজ্ঞানী মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলে। আগের দিনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খালি চোখে আকাশ দেখতেন। পরবর্তীতে বিশাল এবং শক্তিশালী দূরবিন নিয়ে তারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু সব নক্ষত্র, গ্রহ এবং উপগ্রহ দূরবিন দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রয়োজন হয় নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কৌশল ও যন্ত্রের। তাদের মধ্যে অন্যতম রেডিও টেলিস্কোপ, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, গামা ও এক্স-রে এবং কৃত্রিম উপগ্রহের, সেগুলো কতগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজে ব্যবহৃত এই সকল উপকরণের (টেলিস্কোপের) মূলনীতিসহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

রেডিও টেলিস্কোপ

Radio telescope

রেডিও টেলিস্কোপ এক ধরনের দিক নির্দেশী (Directional) বেতার এ্যান্টেনা যা বেতার জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। একই ধরনের এ্যান্টেনা উপগ্রহ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ এবং মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় ভূমিকার ক্ষেত্রে রেডিও টেলিস্কোপ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ থেকে আলাদা কারণ রেডিও টেলিস্কোপ তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালির বেতার কম্পাঙ্ক অংশ ব্যবহার করে। বেতার, টেলিভিশন এবং রাডার হতে নির্গত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে যাতে ব্যতিচার না ঘটে এজন্য রেডিও টেলিস্কোপগুলোকে লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা হয়। এরিকিবো মানমন্দিরে ব্যবহৃত রেডিও টেলিস্কোপটি জগৎ বিখ্যাত এবং সংবেদনশীল। বর্তমানে ব্যবহৃত ডিস এন্টেনা হলো রেডিও টেলিস্কোপের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

বেতার বর্ণালি তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালির একটা বড় পরিসর জুড়ে অবস্থান করে (3kHz–300GHz)। এর অর্থ রেডিও টেলিস্কোপে যে ধরনের এ্যান্টেনা ব্যবহৃত হয় সেগুলোর নকশা, আকার এবং বিন্যাসের দিক থেকে বেশ ভিন্নতর। তারা, নক্ষত্র, কোয়াসার ও অন্যান্য জ্যোতি পদার্থ থেকে প্রাকৃতিকভাবে নির্গত বেতার নির্গমন অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করার জন্য রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়। রেডিও টেলিস্কোপ মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। রেডিও টেলিস্কোপ উপরোক্ত বস্তুগুলোর প্রতিবিম্বও গঠন করতে পারে।

মূলনীতি (Principle)

এই যন্ত্রের মৌলিক কার্যনীতি দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্যবহৃত প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতোই। আপতিত তরঙ্গ, তা বেতার বা দৃশ্যমান যা-ই হোক না কেন, একটি নিখুঁত দর্পণে বাধাগ্রস্ত হয়ে একটি সাধারণ অভিসারী বিন্দুতে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিফলন পৃষ্ঠতল এবং আপতিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিফলন পৃষ্ঠতলের আকৃতি এমন হতে হবে যেন বেতার তরঙ্গগুলো সেখান থেকে প্রতিফলনের পর অভিসারী বিন্দুতে একই দশায় মিলিত হতে পারে। এর জন্য প্রতিফলন বিন্দু থেকে অভিসারী বিন্দু পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠতলের বিভিন্ন বিন্দুতে একই হতে হবে। এই শর্ত অবশ্য সহজেই মেটানো যায়, কেবল প্রতিফলন পৃষ্ঠতলটি পরাবৃত্ত আকৃতির করে দিলেই হলো। এজন্যেই আধুনিক বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলোর প্রতিফলন পৃষ্ঠতল তথা ডিশের আকৃতি পরাবৃত্তীয় হয়ে থাকে। এছাড়া এ ধরনের দূরবীক্ষণের দর্শন তথা পর্যবেক্ষণের কাজটি 1 মিমি থেকে 30 মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে করতে হয়। কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য 30 মিটারের বেশি হলে আয়নমণ্ডলে শোষণ ঘটে আর 1 মিলিমিটারের চেয়ে কম হলে বায়ুমণ্ডলের পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ওজোন কর্তৃক শোষিত হয়।

চিত্র ১১.১১ : রেডিও টেলিস্কোপ।

এভাবে অভিসারী বিন্দুতে বেতার তরঙ্গগুলোকে একত্রিত করা হলেও সেগুলো সাধারণত খুবই ক্ষীণ থাকে। এদেরকে পর্যবেক্ষণের উপযোগী করতে হলে বিবর্ধিত করতে হয়। প্রথমে আপতিত এবং অভিসারী বিন্দুতে একত্রিত বেতার কম্পাঙ্ক সংকেতকে অভিসারী বিন্দুতে 10 থেকে 1000 গুণ বিবর্ধিত করা হয়। এই বিবর্ধিত কম্পাঙ্ককে তাদের ক্ষুদ্রতর কম্পাঙ্কে পরিবর্তিত করা হয় যাকে মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ক বলা হয়। এই মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ককে সহজেই তারের মাধ্যমে অভিসারী বিন্দু থেকে দূরবীক্ষণ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো যায়। এখানে মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ককে আরও বর্ধিত করা হয় যাতে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্পষ্ট কম্পাঙ্ককে এমনভাবে তথ্যপ্রদর্শনী যন্ত্রে প্রদর্শন করা হয় যার মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ কাজে সর্বোচ্চ উপযোগিতা লাভ করতে পারেন। ১১·১১ চিত্রে রেডিও টেলিস্কোপ দেখানো হলো।

অপটিক্যাল টেলিস্কোপ
Optical telescope

অপটিক্যাল টেলিস্কোপে সরাসরি বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা, আলোকচিত্র নেয়া এবং উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালির প্রধানত দৃশ্যমান অংশ সংগ্রহ এবং নিবন্ধ করে। অপটিক্যাল টেলিস্কোপ প্রধানত তিন ধরনের—

(১) প্রতিসারক— লেন্স ব্যবহৃত হয়।
(২) প্রতিফলক— আয়না ব্যবহৃত হয়।
(৩) ক্যাটাডায়প্ট্রিক— লেন্স এবং আয়না উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

পর্যবেক্ষণীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, পক্ষীবিজ্ঞান, শত্রুপক্ষের অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়।

জানার বিষয় : প্রতিফলক অপটিক্যাল টেলিস্কোপ আয়না হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মূলনীতি (Principle)

অপটিক্যাল টেলিস্কোপে আগত রশ্মিগুলোকে বস্তু লেন্সের সাহায্যে একত্রিত করে টেলিস্কোপের ভেতর প্রেরণ করে। রশ্মিগুলো একত্রিত করার কাজটি টেলিস্কোপের সামনে লাগানো বস্তু লেন্স (উত্তল লেন্স বা অবতল দর্পণ) সম্পন্ন করে। দূর থেকে আগত আলোক রশ্মি ফোকাস তলের একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে বস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এই প্রতিবিম্ব বা ইমেজ চক্ষু লেন্সের দ্বারা বিবর্ধিত চোখে এসে পড়ে এবং লক্ষ্যবস্তুর বিবর্ধিত বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এখানে চক্ষু লেন্স বিবর্ধিত কাচের (magnifying glass) ন্যায় কার্য সম্পন্ন করে। এটাই অপটিক্যাল লেন্সের মূলনীতি। ১১·১২ চিত্রে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দেখানো হলো।

চিত্র ১১.১২ : অপটিক্যাল টেলিস্কোপ।

গামা-রে টেলিস্কোপ
Gamma-ray telescope

আমরা জানি, তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক/তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রসার অত্যন্ত বেশি। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য অনুসারে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন নামকরণ প্রচলিত আছে। যেমন, রেডিও তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ, দৃশ্যমান তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি। গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 10^{-11}m থেকে 10^{-15}m পর্যন্ত বিস্তৃত। তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালির সবচেয়ে শক্তিশালী ফোটন দ্বারা গামা রশ্মি গঠিত। এই ফোটনের শক্তি 10^{7} eV থেকে 10^{15} eV পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। পারমাণবিক নিউক্লিয়াস থেকে গামা রশ্মি বিকিরণ ১১.১৩ চিত্রে দেখানো হলো।

গামা রশ্মি নিঃসরণের উৎসসমূহ
Sources of gamma ray emission

(i) পরমাণুর নিউক্লিয়াস উত্তেজিত হয়ে উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে স্থানান্তরের ফলে এ রশ্মি নির্গত হয়।
(ii) তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিশ্লেষণের (disintegration) সময় এ রশ্মি নির্গত হয়।
(iii) মহাবিশ্বে সবচেয়ে উত্তপ্ত এবং শক্তিশালী বস্তুসমূহে বিভিন্ন বিক্রিয়ার কারণে গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। যেমন নিউট্রন নক্ষত্র, পালসার (Pulsar), সুপারনোভা বিস্ফোরণ, কৃষ্ণ বিবরের পরিপার্শ্ব ইত্যাদি।

গামা-রে টেলিস্কোপ গামা রশ্মি বিকিরণকে চিহ্নিত ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। মহাজাগতিক গামা রশ্মি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাশূন্যে সংঘটিত বিভিন্ন প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ঘটনা (Violent events) ও উৎসগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

প্রতিটি তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস হতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক গামা রশ্মি নিসৃত হয়; সুতরাং নিসৃত বিকিরণ দ্বারা উক্ত নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থ শনাক্ত করা সম্ভব। মহাবিশ্বের নক্ষত্র, ছায়াপথসমূহ হতে আগত গামা রশ্মি পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি এবং নির্দিষ্ট নিউক্লীয় ঘটনাবলির অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

মূলনীতি (Principle) :

গামা-রে টেলিস্কোপ সাধারণ টেলিস্কোপের মতো নয়। আলো বা এক্স-রশ্মির মতো সাধারণ দর্পণে গামা রশ্মি ধরা যায় না। গামা রশ্মির ভেদনক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় দর্পণের ভেতর দিয়ে চলে যায় এবং শোষণ বা প্রতিফলন ঘটায় না। গামা রশ্মি শনাক্তকরণের জন্য এক বিশেষ ধরনের ডিটেকটর (detector) ব্যবহার করা হয় যাকে সিন্টিলেশন ডিটেকটর (scintillation detector) বলা হয়। এই ডিটেকটরের ভেতরে ঘন সন্নিবিষ্ট স্ফটিক (crystal)-এর ব্লক থাকে। গামা রশ্মি যখন এই স্ফটিকে প্রবেশ করে তখন এর ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং চার্জিত কণা সৃষ্টি হয়। এই চার্জিত কণা ডিটেকটরের সেন্সরে ধরা পড়ে এবং প্রতিবিম্ব তৈরি করে। কম্পটন বিক্ষেপ টেলিস্কোপ (Compton Scatter Telescope) এ ধরনের একটি গামা-রে টেলিস্কোপ।

চিত্র ১১.১৩ : পারমাণবিক নিউক্লিয়াস থেকে গামা বিকিরণ।

এক্স-রে টেলিস্কোপ
X-ray telescope

মহাকাশে সংঘটিত বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক (violent) ঘটনা থেকে এক্স-রে নির্গত হয়। যেমন কোনো নক্ষত্রের বিস্ফোরণে প্রচণ্ড তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এক্সরে নির্গত হয়। এক্স-রে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ শক্তির তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ। এক্স-রে টেলিস্কোপ এসব এক্স-রশ্মি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশির ভাগ মহাজাগতিক এক্স-রশ্মি শোষিত হয় বলে এক্স-রে টেলিস্কোপ কৃত্রিম উপগ্রহ, রকেট বা বেলুনে স্থাপন করে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত এক্স-রশ্মি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক্স-রে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় সাধারণ দর্পণের ভেতর দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারে, তাই এক্স-রে টেলিস্কোপে এক্স-রে চিহ্নিত করার জন্য ধাতব দর্পণ ব্যবহার করা হয়। টেলিস্কোপে দর্পণগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে এক্স-রশ্মি অতি ক্ষুদ্র কোণে আপতিত ও প্রতিফলিত হয় যেমন কোনো পাতলা নুড়ি পাথর পুকুরের পানির ওপর অতি অল্প কোণে নিক্ষেপ করলে পানির তলকে স্পর্শ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

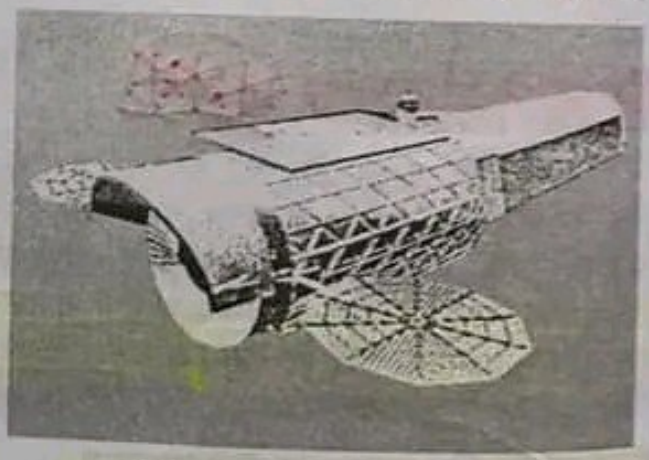

মূলনীতি (Principle) : এক্স-রে টেলিস্কোপে ধাতব নির্মিত দর্পণ ব্যবহার করা হয়। মহাজাগতিক বস্তু থেকে আগত এক্স-রশ্মি যাতে টেলিস্কোপের দর্পণে শোষিত না হয় সেজন্য দর্পণের পৃষ্ঠগুলো স্বর্ণ বা ইরিডিয়ামের পাতলা স্তর দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এক্স-রশ্মিকে দর্পণ তলে অতিক্ষুদ্র কোণে আপতিত ও প্রতিফলিত করা হয়। প্রতিফলিত এক্স রশ্মি ফোটন ডিটেকটরে সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র ১১.১৪ : এক্স রশ্মি টেলিস্কোপ।

ডিটেকটর শোষিত ফোটনের শক্তি, সময়, দিক রেকর্ড করে। ফটো ডায়োড চার্জড কাপলড ডিভাইস (Charged Coupled Device)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে মহাজাগতিক পরিবেশের গঠন এবং অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। চিত্র ১১·১৪-এ একটি এক্স-রশ্মি টেলিস্কোপ দেখানো হয়েছে।

১৯৯৯ সালে স্থাপিত চন্দ্র (Chandra) নামে একটি মহাকাশ এক্স-রশ্মি টেলিস্কোপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই টেলিস্কোপ ছায়াপথের বিভিন্ন নক্ষত্র, নিউট্রন তারকা, কৃষ্ণ গহ্বরের ছবি প্রেরণ করে নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করছে।

মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ
Artificial satellite in space research

কৃত্রিম উপগ্রহ হলো মানুষ নির্মিত মহাকাশযান যা রকেটের সাহায্যে

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে [চিত্র ১১.১৫]। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে উপগ্রহে বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ স্থাপন করে মহাজাগতিক বস্তু পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা যায়। হাবল টেলিস্কোপ, এক্স-রে টেলিস্কোপ, গামা-রে টেলিস্কোপ এ ধরনের টেলিস্কোপ। 1990 সালে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope) পৃথিবী হতে 600 km উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপন করা হয়। এই টেলিস্কোপ মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র, গ্যালাক্সির স্পষ্ট চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করছে যা পর্যালোচনা করে মহাবিশ্বের বয়স, কৃষ্ণ গহ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল তা হাবল টেলিস্কোপ প্রেরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত হয়েছে।

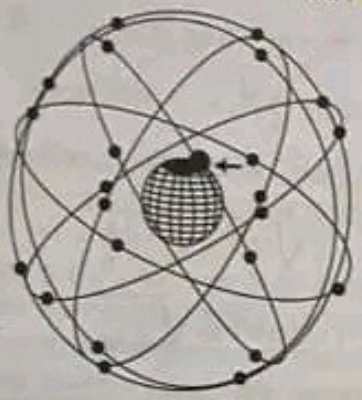

চিত্র ১১.১৫ : কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ণনের কক্ষপথ।

মূলনীতি (Principle) : কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ বেগসম্পন্ন রকেটের সাহায্য নেওয়া হয়। বায়ুর বাধা এড়ানোর জন্য এই রকেট দিয়ে উপগ্রহকে কয়েক' কিলোমিটার ওপরে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ এমনভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান হয় যাতে ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল এটি পৃথিবীর অভিকর্ষীয় বল হতে পায়। কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এবং পর্যায়কাল নিম্নের সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা যায়।

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

এবং $$T = 2\pi (R+h)\sqrt{\frac{R+h}{GM}}$$

এখানে R = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, M = পৃথিবীর ভর, h = পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে উপগ্রহের উচ্চতা, G = মহাকর্ষ ধ্রুবক। কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এবং পর্যায়কাল তার ভরের ওপর নির্ভরশীল নয়।

গাণিতিক উদাহরণ ১১.৩

১। একটি নক্ষত্রের ভর $4\ M_0$। নক্ষত্রটি যদি কৃষ্ণ বিবরে রূপান্তরিত হয় তবে এর শোয়ার্জশিল্ড বা সংকট ব্যাসার্ধ কত হবে ? [সূর্যের ভর $M_0 = 1{\cdot}99 \times 10^{30}$ kg]

আমরা জানি,

শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ,

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

$$= \frac{2 \times 6{\cdot}67 \times 10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2} \times 4 \times 1{\cdot}99 \times 10^{30}\ kg}{(3 \times 10^8\ ms^{-1})^2}$$

$$= 11{\cdot}80 \times 10^3\ m$$

$$= 11{\cdot}80\ km$$

এখানে,

$M = 4\ M_0$

$M_0 = 1{\cdot}99 \times 10^{30}$ kg

২। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ থেকে জানা যায় যে, ভস্মীভূত নক্ষত্র এর নিজের মহাকর্ষের প্রভাবেই ধ্বসে হয়ে কৃষ্ণ বিবরে রূপ নিতে পারে। তবে এজন্য এর ভর হতে হবে দুই সৌর ভরের সমান। (সূর্যের ভর = 2×10^{30} kg হলো এর সৌর ভর)। এ রকম ক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ কত ?

আমরা জানি,

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

$$= \frac{2 \times 6{\cdot}67 \times 10^{-11} \times 4 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2}$$

$$= 5{\cdot}93 \times 10^3\ m$$

$$= 5{\cdot}93\ km$$

এখানে,

নক্ষত্রের ভর,

$M = 2 \times$ সূর্যের ভর

$= 2 \times 2 \times 10^{30}$ kg

$= 4 \times 10^{30}$ kg

ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ, $R_s = ?$